



ব্রজেন্দ্র কুমার দে-এর নির্বাচিত যাত্রাপালা: বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ ও শিল্পসৌকর্যের বিশ্লেষণ

Minati Sau Bhaumik¹ & Dr. Sanchita Banerjee Roy²

1. Research Scholar, Dept. of Bengali, YBN University, Ranchi, Email: saubhaumikminati@gmail.com
2. Asst. Professor, Dept. of Bengali, YBN University, Ranchi, Email: banerjeesanchita28@gmail.com

সারসংক্ষেপ: বাংলা লোকনাট্যের ইতিহাসে যাত্রাপালা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় অভিনয়ধারা। দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক, ধর্মীয় ও কিংবদন্তিনির্ভর আখ্যান যাত্রার প্রধান অবলম্বন হলেও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে যাত্রার বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান শিল্পী ছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে। তিনি একদিকে যাত্রার ঐতিহ্যগত গান, সংলাপ, আবেগ ও অভিনয়ধর্মিতা বজায় রেখেছেন, অন্যদিকে সামাজিক বাস্তবতা, ঐতিহাসিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমকালীন সংকটকে যাত্রার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ‘স্বর্ণলক্ষা’, ‘রাজনন্দিনী’, ‘বাঙালী’, ‘আকালের দেশ’, ‘নিষিদ্ধ ফল/দোষী কে’, ‘শেষ নমাজ’, ‘ধর্মের বলি’, ‘গাঁয়ের মেয়ে’, ‘প্রতিশোধ’, ‘সতী করুণাময়ী’ এবং ‘নন্দী বিনোদিনী’ প্রভৃতি নির্বাচিত পালার আলোকে তাঁর বিষয়নির্বাচন, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ, গান, নাট্যসংঘাত, প্রতীকী ব্যঙ্গনা এবং মঞ্চগপযোগী শিল্পরীতির বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রচলিত দীর্ঘ বক্তৃতামূলক সংলাপ ও কৃত্রিম রঙ্গরসের পরিবর্তে যাত্রাকে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরুচির নতুন পথে পরিচালিত করেছিলেন। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুসারে, তিনি পৌরাণিক ও ইতিহাস-আশ্রিত পালার পাশাপাশি সামাজিক, বিপ্লবী, জীবনী ও কাল্পনিক পালার রচনা করেন।

মূলশব্দ: ব্রজেন্দ্রকুমার দে, বাংলা যাত্রা, যাত্রাপালা, লোকনাট্য, সামাজিক পালার, ঐতিহাসিক পালার, চরিত্রচিত্রণ, শিল্পসৌকর্য, জাতীয়তাবাদ, লোকসংস্কৃতি।

ভূমিকা: বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে যাত্রা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক চেতনা এবং জীবনবোধের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকাশভঙ্গি। যাত্রার আসর ছিল মূলত উন্মুক্ত জনপারিসর, যেখানে অভিনয়, গান, নৃত্য, সংলাপ এবং দর্শকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মিলিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র নাট্যপরিবেশ সৃষ্টি করত। ফলে যাত্রাপালার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে গেলে শুধু লিখিত পাঠের দিকে তাকালে চলবে না; তার মঞ্চযোগ্যতা, শ্রুতিমাধুর্য, অভিনয়যোগ্যতা এবং জনসম্পৃক্ততার দিকও বিবেচনা করতে হয়।

উনিশ শতক ও বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলা যাত্রার বিষয়ভাণ্ডারে পৌরাণিক ও ধর্মীয় আখ্যানের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলন, সামাজিক পরিবর্তন, ঔপনিবেশিক শাসন, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যাত্রার বিষয়বস্তুকে নতুন মাত্রা দেয়। মুকুন্দদাসের স্বদেশি যাত্রার উত্তরাধিকারকে আরও বিস্তৃত ও শিল্পসম্মত করে তোলার ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাপিডিয়াও উল্লেখ করেছে যে তিনি প্রচলিত যাত্রার দীর্ঘ, বক্তৃতামূলক সংলাপ ও গতানুগতিক রঙ্গরসের পরিবর্তে বিষয় ও আঙ্গিকে বৈচিত্র্য আনেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর বিশেষত্ব এখানেই যে তিনি যাত্রাকে একদিকে লোকশিল্পের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন, অন্যদিকে সমকালীন সাহিত্যিক ও সামাজিক চেতনাকে এর মধ্যে সন্নিবেশ করেছেন। তাঁর পালায় পুরাণ যেমন আছে, তেমনি

আছে ইতিহাস; কাল্পনিক আখ্যান যেমন আছে, তেমনি আছে বাস্তব সামাজিক সমস্যা। ‘আকালের দেশ’-এ দুর্ভিক্ষের অভিঘাত, ‘নিষিদ্ধ ফল/দোষী কে’-তে সামাজিক সংকট, ‘শেষ নমাজ’-এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবিকতার প্রশ্ন এবং অন্যান্য পালায় জাতীয় ও সামাজিক চেতনা তাঁর সৃষ্টিশীলতার বিস্তারকে নির্দেশ করে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে : জীবন ও যাত্রাসাহিত্যে আবির্ভাব: ব্রজেন্দ্রকুমার দে ১৯০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান শরীয়তপুর জেলার গঙ্গানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরকিশোর দে এবং মাতা ক্ষীরোদা সুন্দরী। ১৯২২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই যাত্রার প্রতি তাঁর আকর্ষণ তৈরি হয়। তাঁর প্রথম রচিত যাত্রাপালা ‘স্বর্ণলঙ্কা’ ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় বলে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ আছে।

তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে যাত্রাপালা রচনার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ করা যায়। তিনি শুধু প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যান পুনর্লিখন করেননি; বরং যাত্রার বিষয় ও আঙ্গিকে ক্রমশ সমকালীন করে তুলেছেন। ‘রাজনন্দিনী’ কাল্পনিক পালার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ১৯৪২ সালে রঞ্জন অপেরার জন্য রচিত এই পালার মাধ্যমে কাল্পনিক আখ্যানকে যাত্রার বিষয় হিসেবে গ্রহণের একটি নতুন পথ তৈরি হয়েছিল বলে গবেষণামূলক আলোচনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে এই কাল্পনিক আখ্যানের ধারাই ঐতিহাসিক পালার বিস্তারের দিকে এগিয়ে যায়।

তাঁর যাত্রারীতি সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল যাত্রাকে শুধু চটুল বিনোদনের স্তরে না রেখে একটি অর্থবহ জনশিল্পে পরিণত করা। তাঁর হাতে যাত্রায় সামাজিক বাস্তবতা, জাতীয় ইতিহাস, রাজনৈতিক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ গুরুত্ব লাভ করে।

নির্বাচিত যাত্রাপালার বিষয়বৈচিত্র্য

পৌরাণিক আখ্যান থেকে আধুনিক জীবনচেতনা: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সাহিত্যিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পৌরাণিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে তার সঙ্গে আধুনিক জীবনবোধের সংযোগ স্থাপন। ‘স্বর্ণলঙ্কা’ তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের রচনার উদাহরণ। পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যেও তিনি নাটকীয় সংঘাত, চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন এবং নৈতিক প্রশ্নকে গুরুত্ব দেন।

এই ধরনের পালায় দেবতা, রাজা, বীর ও অসুরের প্রচলিত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-ব্যক্তি স্বার্থ এবং ক্ষমতা-নৈতিকতার সংঘাত তৈরি হয়। ফলে পুরাণ কেবল অতীতের কাহিনি হয়ে থাকে না; তা সমকালীন মানবজীবনের নৈতিক সমস্যার প্রতীক হয়ে ওঠে।

‘রাজনন্দিনী’ : কাল্পনিক আখ্যানের নতুন সম্ভাবনা: ‘রাজনন্দিনী’ ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর কাল্পনিক পালার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৯৪২ সালে রঞ্জন অপেরার জন্য রচিত এই পালার মাধ্যমে যাত্রায় কাল্পনিক কাহিনিকে নতুনভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। গবেষণামূলক সূত্রে বলা হয়েছে, এই কাল্পনিক পালার মধ্য দিয়ে পরবর্তী ঐতিহাসিক পালার বিকাশের একটি নতুন পথ তৈরি হয়।

এখানে কল্পনা শুধু বিনোদনের উপাদান নয়; কল্পিত চরিত্র ও ঘটনা ব্যবহার করে বৃহত্তর সামাজিক ও নৈতিক সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি ব্রজেন্দ্রকুমার দে-কে প্রচলিত যাত্রাপালাকারদের থেকে আলাদা করে।

‘বাঙালী’ : জাতীয় পরিচয় ও ইতিহাসচেতনা: ‘বাঙালী’ পালায় জাতীয় পরিচয়, বাঙালির সামাজিক অস্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক চেতনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ১৯৪৮ সালে আর্থ অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত এই পালাকে অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ‘শ্রেষ্ঠ কল্পনা-কর্ম’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন বলে একটি গবেষণামূলক আলোচনায় পাওয়া যায়।

‘বাঙালী’ নামটির মধ্যেই একটি বৃহত্তর জাতিসত্তার ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের সংকটের সঙ্গে সামষ্টিক পরিচয়ের প্রশ্নকে যুক্ত করাই এই ধরনের পালার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রজেন্দ্রকুমার দে এখানে জাতীয়তাবাদকে সরল বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না রেখে নাটকীয় পরিস্থিতি ও চরিত্রের সংঘাতের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

‘আকালের দেশ’: দুর্ভিক্ষ ও সামাজিক বাস্তবতার শিল্পরূপ: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সামাজিক চেতনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ‘আকালের দেশ’। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সামাজিক অভিঘাত এই পালার পটভূমিতে প্রতিফলিত হয়। গবেষণামূলক সূত্রে উল্লেখ

রয়েছে যে দুর্ভিক্ষের জন্য মজুতদার, মহাজন ও চোরাকারবারীদের ভূমিকার প্রতি পালাটিতে সমালোচনামূলক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। পালাকার নিজে এটিকে ‘আধা সামাজিক পালা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন বলে সূত্রে উল্লেখ আছে।

‘আকালের দেশ’-এর গুরুত্ব কয়েকটি দিক থেকে বিচার করা যায়—

- বাস্তব সামাজিক সমস্যাকে যাত্রার বিষয় করা; সাধারণ মানুষের দুঃখকে নাটকের কেন্দ্রে নিয়ে আসা; অর্থনৈতিক শোষণ ও মানবিক সংকটের সম্পর্ক দেখানো; দর্শকের আবেগের সঙ্গে সামাজিক সচেতনতার সংযোগ ঘটানো।

এখানে দুর্ভিক্ষ কেবল খাদ্যাভাব নয়; এটি সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং মানবিক মূল্যবোধের সংকটের প্রতীক। এই কারণে ‘আকালের দেশ’ বাংলা যাত্রায় সামাজিক বাস্তবতার বিকাশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

‘নিষিদ্ধ ফল/দোষী কে’ : পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পালার দিকে অগ্রসরতা: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সামাজিক পালার বিকাশের ক্ষেত্রে ‘নিষিদ্ধ ফল’ বা ‘দোষী কে’ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটি গবেষণামূলক আলোচনায় ১৯৬০ সালে রচিত এই পালাটিকে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পালা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পালায় ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক নিয়মের দ্বন্দ্ব, নৈতিকতা ও সামাজিক বিচার, অপরাধ ও দায়বদ্ধতার প্রশ্ন নাটকীয়তার কেন্দ্রে আসে। ‘দোষী কে’ প্রশ্নটি নিজেই একটি অনুসন্ধানী নাট্যপ্রশ্ন—অপরাধের জন্য শুধু ব্যক্তিকে দায়ী করা হবে, নাকি সেই সামাজিক পরিবেশকেও বিবেচনা করা হবে যা অপরাধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে?

এই প্রশ্ন ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তিনি চরিত্রকে শুধু ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’—এই দ্বৈত বিভাজনে আবদ্ধ রাখেননি; বরং সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবও বিবেচনা করেছেন।

‘শেষ নমাজ’ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবিকতার চেতনা: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ‘শেষ নমাজ’। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত এই পালা সামাজিক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং মানবিক সম্পর্কের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে বলে বাংলা শিক্ষামূলক ও সাহিত্যিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

পালাটির তাৎপর্য ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে মানবিক পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সময় মানুষ কীভাবে প্রতিবেশী, বন্ধু বা সহমানবের পরিচয় হারিয়ে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—এই সংকটকে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

এখানে ধর্ম মানুষের নৈতিক উন্নতির পথ হওয়ার পরিবর্তে যখন বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন নাট্যকার মানবিকতার বৃহত্তর মূল্যকে সামনে আনেন। ফলে ‘শেষ নমাজ’ শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া নয়; এটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানবিক বিবেকের শিল্পিত প্রকাশ।

‘ধর্মের বলি’ ও ‘গাঁয়ের মেয়ে’ : সামাজিক বিভাজন ও সাধারণ মানুষের জীবন: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর পালায় সামাজিক বিভাজনের নানা রূপ উপস্থিত হয়েছে। ‘ধর্মের বলি’ ও ‘গাঁয়ের মেয়ে’-র মতো পালায় সামাজিক পরিচয়, গ্রামীণ জীবন, মানুষের সম্পর্ক এবং সংকটকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। একটি শিক্ষামূলক সূত্রেও ‘ধর্মের বলি’ ও ‘গাঁয়ের মেয়ে’-কে প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে রচিত পালা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘গাঁয়ের মেয়ে’ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনযাপন যাত্রার কেন্দ্রে উঠে আসে। গ্রাম এখানে শুধু পটভূমি নয়; সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক কাঠামো ও মানসিকতার সক্রিয় ক্ষেত্র।

এই পালাগুলির মাধ্যমে ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রমাণ করেন যে যাত্রার নাটকীয়তার জন্য রাজা-রাজড়া বা দেবদেবীর প্রয়োজন নেই; সাধারণ মানুষের জীবনও শক্তিশালী নাট্যবিষয় হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার যাত্রারূপ : ‘প্রতিশোধ’ ও ‘সতী করুণাময়ী’: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর শিল্পসৃষ্টির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে যাত্রারূপ দেওয়া। ‘মস্তক বিক্রয়’ কবিতা অবলম্বনে তিনি ‘প্রতিশোধ’, ‘পূজারিণী’ অবলম্বনে ‘শেষ আরতি’

এবং ‘সামান্য ক্ষতি’ অবলম্বনে ‘সতী করুণাময়ী’ রচনা করেন বলে একটি সাহিত্যিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। এসব পালার কয়েকটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যাত্রাদলেও অভিনীত হয়েছিল।

এখানে দুটি শিল্পধারার সংযোগ ঘটে—রবীন্দ্রসাহিত্যের কাব্যিকতা এবং যাত্রার অভিনয়নির্ভরতা। কবিতার সংক্ষিপ্ত ও ঘনীভূত ভাবকে যাত্রার দীর্ঘ নাট্যপরিসরে রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকারকে চরিত্র, সংলাপ, গান এবং ঘটনাবিন্যাস সম্প্রসারণ করতে হয়েছে।

এই রূপান্তর প্রমাণ করে যে ব্রজেন্দ্রকুমার দে শুধু মৌলিক পালাকার ছিলেন না; অন্য সাহিত্যিকের সৃষ্টিকেও যাত্রার নিজস্ব ভাষায় পুনর্নির্মাণ করার দক্ষতা তাঁর ছিল।

‘নন্দী বিনোদিনী’ : লোকরস ও মঞ্চসৌকর্য: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর জনপ্রিয় পালাগুলির মধ্যে ‘নন্দী বিনোদিনী’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি গবেষণাধর্মী আলোচনায় পালাটিকে তাঁর বহুল অভিনীত যাত্রাপালা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এটি দীর্ঘ সময় ধরে যাত্রাগানে অভিনীত হয়েছে।

এই ধরনের পালায় তাঁর নাট্যরচনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়—একদিকে কাহিনির আবেগ ও নাটকীয়তা, অন্যদিকে গান ও অভিনয়ের সমন্বয়। যাত্রার শ্রুতিনির্ভর পরিবেশে গান শুধু বিরতির উপাদান নয়; গান চরিত্রের আবেগ, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা এবং কাহিনির অগ্রগতির মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর চরিত্রচিত্রণ

সাধারণ মানুষকে নাটকের কেন্দ্রে স্থাপন: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকৌশলগুলির একটি হল সাধারণ মানুষকে নাটকের কেন্দ্রে নিয়ে আসা। পূর্ববর্তী যাত্রায় দেবদেবী, রাজা, বীর বা পৌরাণিক নায়কের প্রাধান্য ছিল। তাঁর হাতে কৃষক, গ্রামবাসী, দরিদ্র মানুষ, নিপীড়িত ব্যক্তি, নারী এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক মানুষ নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে।

ফলে দর্শক চরিত্রগুলির সঙ্গে সহজে আত্মপরিচয় স্থাপন করতে পারে। যাত্রার জনপ্রিয়তার সঙ্গে এই চরিত্রনির্মাণের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

নায়ক চরিত্র: তাঁর নায়করা সাধারণত নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। নায়ক কেবল শক্তিমান বা বীর নয়; সে কখনও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, কখনও মানবিকতার প্রতিনিধি, কখনও জাতীয় চেতনার বাহক।

এই কারণে নায়ক চরিত্রে ব্যক্তিগত বীরত্বের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বের ধারণা যুক্ত হয়।

নারী চরিত্র: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর পালায় নারী চরিত্র কেবল নায়কের প্রেমিকা বা সহায়ক চরিত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। পারিবারিক সংকট, সামাজিক নিয়ম, নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে নারী চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

‘গাঁয়ের মেয়ে’, ‘সতী করুণাময়ী’ প্রভৃতি পালার আলোচনায় নারী চরিত্রের আবেগ, সামাজিক অবস্থান এবং নৈতিক শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া যায়। যাত্রায় নারী-পুরুষ চরিত্রের সম্মিলিত অভিনয়ের ঐতিহ্যও তাঁর পালার মঞ্চরূপকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিপক্ষ চরিত্র: তাঁর প্রতিপক্ষ চরিত্রগুলি একমাত্রিক নয়। মহাজন, শোষক, ক্ষমতালোভী ব্যক্তি, ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রতিনিধি বা সামাজিক অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত চরিত্রের মাধ্যমে তিনি নির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যাকে নাট্যরূপ দেন।

‘আকালের দেশ’-এর সামাজিক বাস্তবতা এবং ‘দোষী কে’-এর নৈতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ চরিত্র শুধু ব্যক্তিগত খলনায়ক নয়; তারা বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিও হতে পারে।

সংলাপের শিল্প: যাত্রাপালার অন্যতম প্রধান শক্তি সংলাপ। ঐতিহ্যগত যাত্রায় দীর্ঘ বক্তৃতামূলক সংলাপ প্রচলিত ছিল। ব্রজেন্দ্রকুমার দে এই প্রবণতার সংস্কার করেন। বাংলাপিডিয়া তাঁকে দীর্ঘ, অস্বাভাবিক বক্তৃতাপূর্ণ সংলাপ ও গতানুগতিক রঙ্গরসের পরিবর্তে যাত্রার বিষয় ও আগ্রহকে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

তাঁর সংলাপের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—

- শ্রুতিমধুরতা;
- নাটকীয়তা;
- আবেগের তীব্রতা;
- সহজবোধ্যতা;
- সামাজিক বক্তব্য;
- পরিস্থিতিনির্ভরতা;
- চরিত্রের স্বভাব অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার।

যাত্রার দর্শক প্রধানত শ্রোতা হওয়ায় সংলাপকে দৃশ্যের পাশাপাশি শব্দের মাধ্যমেও কার্যকর হতে হয়। ব্রজেন্দ্রকুমার দে এই শ্রুতিনির্ভরতার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন।

গান ও সংগীতের ব্যবহার: যাত্রাপালার প্রাণ হল গান। ব্রজেন্দ্রকুমার দে গানকে কাহিনির অলংকার হিসেবে নয়, নাট্যক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

তাঁর গানে সাধারণত দেখা যায়—

১. চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশ;
২. দেশপ্রেম ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি;
৩. দৃশ্যান্তরের সংযোগ;
৪. দর্শকের আবেগ জাগানো;
৫. বক্তব্যকে সহজ ও স্মরণযোগ্য করা।

যাত্রার মৌখিক ও শ্রুতিনির্ভর ঐতিহ্যের কারণে গান দর্শকের মনে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে তাঁর পালায় সংগীত নাট্যবস্তুকে জনমানসে পৌঁছে দেওয়ার কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

নাট্যসংঘাত ও কাহিনিবিন্যাস: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর পালায় সাধারণত দ্বন্দ্বনির্ভর কাহিনি দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব হতে পারে—

- ন্যায় ও অন্যায়ের;
- ব্যক্তি ও সমাজের;
- ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও মানবিকতার;
- শোষণ ও শোষিতের;
- কর্তব্য ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার;
- দেশীয় চেতনা ও পরাধীনতার;

- ঐতিহ্য ও পরিবর্তনের।

এই দ্বন্দ্বই পালাকে নাটকীয় গতি প্রদান করে। বিশেষ করে সামাজিক পালায় সমস্যার উপস্থাপনা থেকে সংঘাত এবং সংঘাত থেকে পরিণতির দিকে কাহিনি অগ্রসর হয়।

প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর শিল্পরীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা। বাংলাপিড়িয়ার আলোচনায়ও উল্লেখ রয়েছে যে সমকালীনতার দাবি মেটাতে তিনি কোনো কোনো চরিত্রকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছিলেন।

ফলে একটি চরিত্র একই সঙ্গে ব্যক্তি এবং সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে। একটি ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের হলেও তার ব্যঞ্জনা বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রসারিত হয়।

এই প্রতীকী নির্মাণ তাঁর পালাকে সরল ঘটনাবর্ণনার সীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে।

ইতিহাসচেতনা ও জাতীয়তাবাদ: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর বহু পালায় ইতিহাস শুধু অতীতের পুনর্নির্মাণ নয়; বর্তমানকে বোঝার একটি মাধ্যম। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা ব্যবহার করে তিনি জাতীয় আত্মপরিচয়, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক ঐক্যের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

‘বাঙালী’, ‘প্রতিশোধ’ প্রভৃতি রচনায় জাতীয় ও নৈতিক চেতনার উপস্থিতি এই প্রবণতার উদাহরণ। পরবর্তীকালে তাঁর ঐতিহাসিক পালাগুলি যাত্রার জনপ্রিয়তা ধরে রাখতেও সহায়তা করেছে।

শিল্পসৌকর্যের বৈশিষ্ট্য: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর পালার শিল্পসৌকর্য কয়েকটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়।

ক. কাহিনির নাটকীয়তা: তাঁর কাহিনিতে সংঘাত, উত্তেজনা, আবেগ এবং পরিণতির যথাযথ ব্যবহার আছে। ফলে দর্শক কাহিনির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

খ. ভাষার সরলতা: তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা সাধারণ দর্শকের কাছে সহজবোধ্য। একই সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী আবেগঘন ও কাব্যিক ভাষাও ব্যবহার করেছেন।

গ. গান ও সংলাপের সমন্বয়: গান ও সংলাপের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নেই। গান কাহিনির আবেগকে প্রসারিত করে এবং সংলাপ নাট্যগত পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ঘ. চরিত্রের বৈচিত্র্য: রাজা, প্রজা, কৃষক, দরিদ্র মানুষ, নারী, শোষক, প্রতিবাদী চরিত্র—বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের উপস্থিতি তাঁর পালাকে বহুমাত্রিক করেছে।

ঙ. মঞ্চগোপযোগিতা: যাত্রা লিখিত সাহিত্য নয়, মূলত অভিনয়নির্ভর শিল্প। ব্রজেন্দ্রকুমার দে সংলাপ, গান, প্রবেশ, সংঘাত এবং আবেগকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে তা মঞ্চে কার্যকর হয়।

লোকজ উপাদানের ব্যবহার: ব্রজেন্দ্রকুমার দে আধুনিক বিষয় গ্রহণ করলেও যাত্রার লোকজ চরিত্রকে বিসর্জন দেননি। লোকভাষা, গান, আবেগ, হাস্যরস, নাটকীয়তা এবং দর্শকসম্পৃক্ততা তাঁর পালার স্বাভাবিক অংশ।

এই কারণেই তাঁর রচনা একদিকে সাহিত্যিক, অন্যদিকে গভীরভাবে লোকমুখী। তাঁর শিল্পরীতি বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহ্য ও আধুনিক নাট্যচেতনার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর যাত্রাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সামাজিক দায়বদ্ধতা। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, মানুষের নৈতিক সংকট—এসব তাঁর পালায় নাট্যবিষয় হয়ে উঠেছে।

‘আকালের দেশ’-এর ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে সামাজিক শোষণের প্রশ্ন, ‘শেষ নমাজ’-এ সাম্প্রদায়িকতার পটভূমিতে মানবিকতার প্রশ্ন এবং ‘দোষী কে’-তে সামাজিক নৈতিকতার প্রশ্ন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে।

এই কারণে তাঁর যাত্রা নিছক বিনোদনমূলক নয়; তা জনসচেতনতারও একটি মাধ্যম।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাংলা যাত্রার আধুনিকীকরণ: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবত যাত্রার বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর আধুনিকীকরণ। তাঁর হাতে—

পৌরাণিক পালা → কাল্পনিক পালা → ঐতিহাসিক পালা → সামাজিক পালা → বিপ্লবী/জাতীয়তাবাদী পালা → জীবনীভিত্তিক পালা

—এই বিস্তৃত ধারার বিকাশ ঘটেছে।

বাংলাপিডিয়ায় তাঁকে সামাজিক, বিপ্লবী, জীবনী ও কাল্পনিক পালা রচনার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তাঁর অবদান শুধু নতুন বিষয় নির্বাচনে নয়; যাত্রার ভাষা, চরিত্র, সংলাপ ও নাট্যরীতির পরিবর্তনেও। এই কারণে তাঁকে বাংলা যাত্রার আধুনিকীকরণের অন্যতম প্রধান কারিগর হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

নির্বাচিত পালার তুলনামূলক পর্যালোচনা

নির্বাচিত পালা	প্রধান বিষয়	কেন্দ্রীয় চেতনা	শিল্পগত বৈশিষ্ট্য
স্বর্ণলক্ষা	পৌরাণিক আখ্যান	নৈতিক দ্বন্দ্ব	পৌরাণিক নাট্যরীতি
রাজনন্দিনী	কাল্পনিক কাহিনি	মানবিক ও নৈতিক সংঘাত	কল্পনা ও নাটকীয়তা
বাঙালী	জাতীয় পরিচয়	জাতীয় চেতনা	প্রতীকী ও ঐতিহাসিক ব্যঙ্গনা
আকালের দেশ	দুর্ভিক্ষ	সামাজিক ন্যায়	বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা
নিষিদ্ধ ফল/দোষী কে	সামাজিক সমস্যা	নৈতিক দায়	সামাজিক নাট্যসংঘাত
শেষ নমাজ	সাম্প্রদায়িক সংঘাত	মানবিকতা	আবেগ ও প্রতীক
ধর্মের বলি	সামাজিক বিভাজন	সম্প্রীতি	সামাজিক নাট্যরীতি
গাঁয়ের মেয়ে	গ্রামীণ জীবন	সাধারণ মানুষের জীবন	লোকজ ভাষা ও চরিত্র
প্রতিশোধ	রবীন্দ্রনাথের কাব্য	নৈতিকতা ও আত্মমর্যাদা	সাহিত্য থেকে যাত্রারূপ
সতী করুণাময়ী	রবীন্দ্রসাহিত্য	মানবিক অনুভূতি	কাব্যিকতা ও অভিনয়
নন্দী বিনোদিনী	সামাজিক/আবেগঘন কাহিনি	মানবিক সম্পর্ক	গান, আবেগ ও মঞ্চসৌকর্য

এই তুলনা থেকে বোঝা যায় যে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর বিস্তার অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি একই শিল্পমাধ্যমের মধ্যে পুরাণ, ইতিহাস, কল্পনা, সমাজ ও মানবিকতার বিভিন্ন স্তরকে ধারণ করেছেন।

সমকালীন যাত্রার তাঁর প্রভাব : ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর রচনার প্রভাব তাঁর জীবদ্দশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশে জাতীয় যাত্রা উৎসব, মেলা ও বিভিন্ন যাত্রাদলে তাঁর পালায় অভিনয় দীর্ঘকাল ধরে হয়েছে বলে সংবাদভিত্তিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

তাঁর পালাগুলির পুনর্মঞ্চগয়ন প্রমাণ করে যে এগুলির মধ্যে এমন কিছু সামাজিক ও নাট্যগুণ রয়েছে যা নির্দিষ্ট সময়ের সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম। পরবর্তী সময়ে ‘মাস্টারদা সূর্যসেন’-এর মতো তাঁর রচিত পালাও মঞ্চস্থ হয়েছে; সমকালীন যাত্রাশিল্পীরা তাঁর রচনাকে পুনর্বিন্যাস করে মঞ্চে এনেছেন।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন: ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর যাত্রাসাহিত্য মূল্যায়নের সময় তাঁর কয়েকটি বিশেষ শক্তি এবং কিছু সীমাবদ্ধতাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, তাঁর পালায় বিষয়বৈচিত্র্য বাংলা যাত্রাকে নতুন সম্ভাবনা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষকে নাটকের কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি যাত্রার দর্শকভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করেছেন। তৃতীয়ত, সামাজিক ও জাতীয় সমস্যাকে নাট্যরূপ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি যাত্রাকে জনসচেতনতার মাধ্যম করেছেন।

তবে তাঁর পালা যাত্রার ঐতিহ্যগত আবেগ, গান এবং অতিনাটকীয়তার সম্পূর্ণ বাইরে নয়। বরং তাঁর সাফল্য ছিল এই উপাদানগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে নতুন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করা। অর্থাৎ তিনি আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেছেন।

উপসংহার: বাংলা যাত্রার ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রকুমার দে একটি যুগান্তকারী নাম। তাঁর কৃতিত্ব শুধু বিপুল সংখ্যক যাত্রাপালা রচনায় নয়; তাঁর প্রকৃত অবদান যাত্রার বিষয়, ভাষা, চরিত্র এবং শিল্পরীতির পরিবর্তনে। তিনি দেখিয়েছেন যে যাত্রা শুধু দেবদেবী, রাজা-রাজড়া বা পৌরাণিক কাহিনির বাহন নয়—সমকালীন সমাজ, সাধারণ মানুষের জীবন, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয় পরিচয়, সামাজিক অন্যায় এবং মানবিক সংকটও যাত্রার শক্তিশালী বিষয় হতে পারে।

‘স্বর্ণলঙ্কা’ থেকে ‘রাজনন্দিনী’, ‘বাঙালী’ থেকে ‘আকালের দেশ’, ‘নিষিদ্ধ ফল/দোষী কে’ থেকে ‘শেষ নমাজ’, ‘ধর্মের বলি’ ও ‘গাঁয়ের মেয়ে’ থেকে রবীন্দ্রনাথ-আশ্রিত ‘প্রতিশোধ’ ও ‘সতী করুণাময়ী’—এই বিস্তৃত রচনাভূমি তাঁর শিল্পীসত্তার বহুমাত্রিক পরিচয় বহন করে। তাঁর চরিত্রগুলি কখনও পুরাণের নায়ক, কখনও ইতিহাসের প্রতিনিধি, আবার কখনও একেবারে সাধারণ গ্রামবাংলার মানুষ। এই বৈচিত্র্য তাঁর পালাকে জীবন্ত ও জনগ্রাহ্য করেছে।

তাঁর সংলাপ শ্রুতিমধুর, গান আবেগনির্ভর, চরিত্রগুলি নাটকীয় এবং কাহিনি মঞ্চেপযোগী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি লোকশিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট না করে তার মধ্যে আধুনিক জীবনচেতনা সঞ্চার করেছেন। এই কারণেই তাঁর হাতে বাংলা যাত্রা একটি নতুন শিল্পরূপের সন্ধান পেয়েছিল। বাংলাপিড়িয়ার ভাষ্যেও তাঁর যাত্রাপালা রচনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর নির্বাচিত যাত্রাপালায় বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ ও শিল্পসৌকর্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে তিনি কেবল একজন সফল পালাকার ছিলেন না; বাংলা লোকনাট্যের আধুনিক রূপান্তরের একজন গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। তাঁর রচনায় লোকজ ঐতিহ্য, সাহিত্যিক কল্পনা, সামাজিক বাস্তবতা, ইতিহাসচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের যে সমন্বয় ঘটেছে, তা বাংলা যাত্রাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

তথ্যসূত্র

১. বাংলা একাডেমি/বাংলাপিড়িয়া। ‘দে, ব্রজেন্দ্রকুমার’। ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবন ও যাত্রাসাহিত্য সম্পর্কে তথ্য।
২. দাস, প্রভাতকুমার। *বাংলার যাত্রা: সঙ্গ অনুষঙ্গ কলকাতা*: দি সি বুক এজেন্সি। গ্রন্থটির আলোচনায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর সামাজিক পালা ও যাত্রার আধুনিকীকরণের প্রসঙ্গ এসেছে।

৩. দে, প্রভাতকুমার। ‘বন্দে মাতরম ও বাংলার যাত্রাপালা’। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর যাত্রার আধুনিকীকরণ ও জনসচেতনতার ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা।
৪. বাগচী, তপন। ‘যাত্রাপালায় ইতিহাসের উপকরণ’। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক পালার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা।
৫. ‘শ্রীচৈতন্য থেকে একুশ শতক’। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর যাত্রাজীবন, ‘আকালের দেশ’ ও সামাজিক পালার বিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনা।
৬. ‘বাংলা নাটক ও যাত্রার ধারা’। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর যাত্রারীতি সংস্কার ও বিষয়বৈচিত্র্য সম্পর্কিত শিক্ষামূলক আলোচনা।
৭. ‘যাত্রাগানে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন’। যাত্রায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর বিষয়বৈচিত্র্য ও নারীচরিত্র প্রসঙ্গ।
৮. ‘রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের যাত্রা’। রবীন্দ্রসাহিত্য অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর ‘প্রতিশোধ’, ‘শেষ আরতি’ ও ‘সতী করুণাময়ী’ প্রসঙ্গে আলোচনা।
৯. ‘সবুজ স্বপ্ন’। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-এর ‘নন্দী বিনোদিনী’ যাত্রাপালার আলোচনা।

Citation: Sau Bhaumik. M. & Banerjee Roy. S., (2026) “ব্রজেন্দ্র কুমার দে-এর নির্বাচিত যাত্রাপালা: বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ ও শিল্পসৌকর্যের বিশ্লেষণ”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-06, June-2026.